কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে

রাজধানী নগরীর ভূগর্ভের পানির লেভেল গত ১১ বছরে ২৬.৬০ মিটার নীচে থেকে ৬১.১৮ মিটার নীচে নেমে গেছে। গড়ে প্রতি বছর ৩ মিটার করে নীচে নামছে। চরম দূষণের কারণে নগরবাসী ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করতে না পারায়, ভূগর্ভের পানির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়ে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে পানির লেভেল হ্রাস অব্যাহত থাকলে, অকস্মাৎ ভূমিধস ঘটতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন। তারা এও বলছেন যে, মাত্রাতিরিক্তভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে ব্যাংকক নগরীতে এরকম ঘটেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সারা বিশ্বেই ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চলছে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে বলেই মাত্র ১১ বছরে ঢাকা নগরীর ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল আগের চেয়ে ৩৫ মিটার নীচে নেমে গেছে। এরকম অবস্থায় যে কোন সময় অকস্মাৎ ভূমি ধস যেমন ঘটতে পারে, তেমনি ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে। সারাবিশ্বে ইতোমধ্যে পানির সংকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পানির নানামুখী ব্যবহার এবং এমনকি রিসাইকেল করেও পানির ব্যবহার চালু হয়েছে দেশে দেশে। যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে পানি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইউরোপের দেশগুলো সারফেস ওয়াটার (ভূপৃষ্ঠস্থ পানি) সংরক্ষণ, দূষণ রোধ এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক সুপ্রয়োগ করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা-প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সেসব দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উত্তোলনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার যত দ্রুত সম্ভব কমিয়ে আনা হচ্ছে।

পানির অপর নাম জীবন এবং এ যাবত যত নগর-বন্দর-জনপদ গড়ে ওঠেছে, যত সভ্যতা বিকশিত হয়েছে, সবই পানি প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিউসেক পানি প্রতি বছর বর্ষায় নদ-নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। এই পানির সুপ্রয়োগ ঘটাতে পারলে শুষ্ক মওসুমে পানির সংকট হওয়ার কথা নয়। শুষ্ক মওসুমে পানি পাওয়া যাচ্ছে না, এটা যেমন সত্য, তেমনি বর্ষা মওসুমে পানি ধরে রাখা যাচ্ছে না, এটাও কম সত্য নয়। শুষ্ক মওসুমে পানি না পাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগের এবং উজান দেশের সঙ্গে নেগোসিয়েশনের বিষয়, এতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উজানের দেশ ভারত, নেপাল এবং চীনের সঙ্গে সমস্যার বাস্তবতা নিয়ে সমঝোতামূলক কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পানির সংকট শুধু বাংলাদেশের যেমন নয়, তেমনি শুধু ভারতেরও নয় কিংবা শুধু নেপালেরও নয় এবং নয় শুধু চীনেরও। সমস্যা সকল দেশের এবং হিমালয়ান দেশগুলোর পানির উৎস এই পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত নদ-নদীগুলো। সব ধরনের অপচয়, অপব্যবহার রোধ করে হিমালয়ান উৎসের পানির সুপ্রয়োগ নিশ্চিত করার নৈতিক দায়িত্ব সকল দেশকেই বহন করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো যদি তাদের ভূখণ্ডে প্রাপ্ত পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সমন্বিত উদ্যোগ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে হিমালয়ান দেশগুলো তা পারবে না কেন? এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নৈতিক যুক্তির দ্বারা উপমহাদেশীয় বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে অগ্রসর হতে হবে। কোন দেশকে বঞ্চিত করে নয়, বরং সম্ভাব্য পানি প্রবাহের সমন্বিত বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করাই দক্ষিণ এশিয়ার আসন্ন পানি সংকট নিরসনের সহজ ও কার্যকর উপায়। কিন্তু এটুকু করেই দায়িত্ব শেষ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা, পানির সংকট বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে বড় ধরনের সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার বিপদ অতীত ইতিহাসে বহু দেশে বহুবার লক্ষ্য করা গেছে। অনেক সভ্যতা ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার এটাও অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারে অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া ছাড়া পানি সংকট সমাধানে আর কোন বিকল্প নেই। নদ-নদী বিধৌত এ দেশে প্রায় তিন শতাধিক নদী ও হাজার হাজার খাল-বিল ও জলাশয় ছিল। পলি জমে ও নানা কারণে এ সবের অধিকাংশই ভরাট হয়ে গেছে এবং অনেক নদী, খাল-বিলের চিহ্ন পর্যন্ত এখন নেই। শুষ্ক মওসুমে উজান থেকে পানি প্রবাহ স্তিমিত হয়ে পড়ায় পানি সংকট তীব্র হয়ে ওঠেছে। দেশের অর্ধেকের বেশী নদ-নদীর সংযোগ রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সাথে, যে নদ বিশ্বের সর্বাধিক পলি বহনকারী নদ। প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ পলি ব্রহ্মপুত্র বহন

করে আনে, সংশ্লিষ্ট নদীগুলো থেকে সেই পলি অপসারণের কোন কার্যকর পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ করা হয়নি। গঙ্গা বা পদ্মা ও সুরমা-কুশিয়ারা বা মেঘনা সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের পানি সংকটের মূল এখানেই নিহিত। দ্বিতীয় সংকট হল, কল-কারখানার বর্জ্য থেকে শুরু করে নানাভাবে নদ-নদীর পানি দূষিত হচ্ছে এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোতে যতটুকুই পানি রয়েছে, তাও বিষাক্ত হয়ে পড়েছে মূলত একারণেই। এসব নিয়ে আলোচনা ও লেখালেখি যথেষ্ট হলেও বর্ষায় পানি ধরে রাখা এবং পানি দূষণ বন্ধ করার জন্য পানি ব্যবস্থাপনার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। অথচ বর্ষাকালে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় কাজে পানির ব্যবহারই শুধু নিশ্চিত করা যায় না, বরং ভূতত্ত্ববিদদের মতে, কৃত্রিম উপায়ে পানি প্রবেশ করিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুষ্ঠু কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

শ্রমশক্তি রফতানীর বাধা দূর করতে হবে

সউদী শ্রমবাজারে বাংলাদেশীদের প্রবেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কোটা প্রথা বাতিল এবং কয়েকটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সউদী পত্র-পত্রিকার খবর মোতাবেক, কোটা প্রথা ভেঙে দেয়া হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশেষ কোটায় রাখা হয়েছিল। মোট শ্রমিক চাহিদার ২১ শতাংশ বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ছিল। গত জানুয়ারীতে সউদী সরকারের মজলিসে শূরা বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা শেষে শ্রমিক কোটা বাতিল করে দেয়। সউদী শ্রমমন্ত্রী ড. গাজী আল হোসাইবি'র বক্তব্য উদ্ধৃত করে খবরে আরও বলা হয়েছে, কয়েকটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কৃষি শ্রমিকসহ গৃহ পরিচারক-পরিচারিকা ধরনের শ্রমিক আর নেয়া হবে না। এখন থেকে কেবল সীমিত সংখ্যক চিকিৎসক ও প্রকৌশলীই নেয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের পর সউদী আরবে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন নেমে এসেছে। ধরপাকড়, নির্যাতন, আকামা বাতিল ও চাকরিচ্যুতি চলছে বেপরোয়াভাবে। বর্তমানে সউদী আরবে অন্ততঃ ২২ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করছে। তারা চলমান ব্যবস্থায় শংকিত, আতংকিত, দিশাহারা। তাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে, ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকাস্থ সউদী দূতাবাস শ্রমিকদের ভিসা প্রদান প্রদান বন্ধ করে দেয়ায় হাজার হাজার শ্রমিকের সউদী আরব গমন বন্ধ হয়ে গেছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে সউদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের এ যাবৎ যেসব আলোচনা ও কথাবার্তা হয়েছে, তাতে কোনো সুফল বেরিয়ে আসে নি। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এই অবস্থাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ তাদের অনেকেই নাকি অপরাধমূলক কাজে জড়িত। তাদের কিছু সংখ্যকের মধ্যে আইন অমান্য করার প্রবণতাও নাকি বিদ্যমান। অথচ এই সউদী আরবেই বাংলাদেশী শ্রমিকদের সততা, ধর্মনিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, উৎপাদনশীলতা এবং আইনানুগামিতার ভূয়সী প্রশংসা আমরা অতীতে অনেক শুনেছি। হঠাৎ করেই তারা সউদী সমাজ ও আইনের প্রতি এরূপ হুমকি হয়ে দাঁড়ালো কেমন করে, সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। স্বীকার করি, লাখ লাখ শ্রমিকের সবাই সমান নয়। তাদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে পারে; কেউ কেউ আইন অমান্যও করে থাকতে পারে। কিন্তু এই 'কতিপয়' শ্রমিকের অন্যায় বা অপরাধের দায় সকল শ্রমিকের ওপর চাপানো কোনো হিসাবেই সৎ বিবেচনার পরিচায়ক হতে পারে না। এর সুবাদে কোটা বাতিলসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধকরণও যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হতে পারে না। চরম উৎকণ্ঠার বিষয় এই যে, সউদী আরবের কিছু পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচারণায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা তিলকে তাল করে দেখাচ্ছে। তাদের অপপ্রচারণার মধ্যে প্ররোচনা ও উস্কানীও রয়েছে। কোনো কোনো পত্রিকায় বাংলাদেশীদের 'হাইওয়ান' বলে অভিহিত করা থেকেই এটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ হ্রাস বা বন্ধ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী একটি দেশ নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। তারা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যাচার করছে। এক শ্রেণীর সউদী পত্র-পত্রিকা তাদের অপপ্রচারের বাহন হিসেবে কাজ করছে। জানা গেছে, আগামী তিন বছরে একটি মাত্র প্রকল্পে ১৫ লাখ শ্রমিক নেবে সউদী আরব। স্বভাবতঃই এই ১৫ লাখ শ্রমিকের একটা

বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে নেয়ার কথা। এই সুযোগ নস্যাৎ করার জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো উঠেপড়ে লেগেছে। বলা বাহুল্য, তারা ইতোমধ্যেই প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছে।

আমাদের দুর্বলতা এখানেই যে, এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আমরা আগে ধরতে পারিনি। নজর রাখতে পারিনি ওই বিশাল শ্রম বাজারটির দিকে। উপযুক্ত সচেতনতা, নিয়মিত যোগাযোগ ও নজরদারী বহাল থাকলে এত বড় বিপর্যয় হয়তো ঘটতে পারতো না। এরপরও গত দু'আড়াই মাসে আমাদের পারফরমেন্স যে খুব আশাব্যঞ্জক হয়েছে, তাও বলা যাবে না। বিশেষ আশংকার দিক এই যে, সউদী শ্রম বাজারে বিপর্যয়ের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও পড়তে পারে। ওই সব দেশে কর্মরত বাংলাদেশীরাও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্সের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এইখাত থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আসছে। এর প্রবাহ কমে গেলে দেশের অর্থনীতি ও জীবন-যাত্রায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য। এমতবস্থায় সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। সউদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে ব্যাপক কূটনেতিক তৎপরতা চালানো জরুরী। বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচারণা রুখে দেয়াও আবশ্যক। এ জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শ্রম বাজার বৃদ্ধির জোর তৎপরতা চালানোর বিকল্প নেই। শ্রম বাজার ধরে রাখা এবং বৃদ্ধি করার মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, সমৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করছে। জনশক্তি রফতানী বাড়াতেই হবে। আর এজন্য যা করণীয়, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারেই তা করতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সমস্যাদি সম্পর্কে আমরা কতটা সচেতন?

মোহাম্মদ আবদুল গফুর

মার্চ মাসকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মারক মাস হিসেবে মনে করা হয়। কারণ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ দিবাগত রাতে পশুশক্তির বলে জনগণের স্বাধিকার চেতনা ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হলে স্বাধীনচেতা জনগণ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে দেয় এবং নয় মাসের মরণপণ লড়াইয়ের মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করার কারণে ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং প্রতিবছর এ দিবস নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়।

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এতে করেই আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সার্থকতা লাভ করে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৬ মার্চ একটি চূড়ান্ত সশস্ত্র স্তরে প্রবেশ করার অর্থও এই নয় যে, ঐদিনই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব অস্বীকার না করেও বলা যায়, শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কখনও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সার্থকতা লাভ করতে পারে না। স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, স্বাধীনতা অর্জন করা যত কঠিন, স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চাইতেও অনেক বেশী কঠিন। এ কথাটা অন্যান্য দেশ সম্পর্কে যতটা সত্য, বাস্তব কারণে তা বাংলাদেশ সম্পর্কে ঢের বেশী সত্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে এ বাস্তবতা যতটা ঐতিহাসিক কারণে সত্য, ততটাই সত্য ভৌগোলিক কারণেও। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক এসব বাস্তবতা চেতনায় রেখেই আমাদের স্বাধীনতার বিভিন্ন সমস্যা যদি আমরা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে এবং সমস্যা মোকাবিলায় বাস্তব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি, তবেই আমাদের

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সার্থকতা লাভ করতে পারে। সে সবের ধার না ধরে যদি স্বাধীনতা দিবস কতিপয় যান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় তবে সে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কিছুতেই সার্থক হতে পারে না।

উপরে উল্লেখিত প্রেক্ষিতে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে চাই, তবে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসবে তাহলো ঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কবে শুরু হয় এবং কোন্ প্রেক্ষাপটে? আমাদের আশংকা– এ প্রশ্নে আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কত দিনের, এর জবাবে অনেকেই বলবেন, নয় মাস। কারণ মুক্তিযুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল নয় মাস। আবার কেউ কেউ বলতে চাইবেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৫২ সাল থেকে, কারণ বায়ান্নর সালে ভাষা আন্দোলন হয়। আর ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই আমাদের স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ ঘটে, একথা তো অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে ঃ ভাষা আন্দোলন তো ১৯৫২ সালে শুরু হয়নি। বায়ান্নর আগে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রথম সফল গণবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষা আন্দোলন তো আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরেই 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

অনেকে এসব বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় বলে মনে করতে চান। যারা এরকম মনে করতে চান, তাদের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ১৯৪৭ সালে এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়ার ফলে আমরা পরাধীন হয়ে যাই? সে ক্ষেত্রে তো এটাও মেনে নিতে হয় যে, ১৯৪৭ সালে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত আমরা স্বাধীন ছিলাম এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়ই আমরা পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ি! অথচ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলার জনগণের পাশাপাশি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ প্রবীণ নেতাদের এবং শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ তরুণ নেতাদের ছিল ঐতিহাসিক অবদান।

তাহলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কবে শুরু হয় এবং কোন্ প্রেক্ষাপটে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে, একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি? এসব প্রশ্নের একটিই মাত্র সঠিক জবাব রয়েছে এবং তাহলো : ১৭৫৭ সালে পলাশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাবার পর পরই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। পলাশীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারের জগৎশেঠ, উমিচাদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের কারণে নবাবের সৈন্যরা স্বাধীনতা রক্ষায় সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আসা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়নি বলে মনের চাপা ক্ষোভ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও পরবর্তীকালে প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সশস্ত্র লড়াইয়ে তারা অবতীর্ণ হয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৭৫৭ সালের পরপরই যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় তার নেতৃত্ব দেন প্রধানত মুসলমানরা এবং এদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বৃটিশ রাজের সহযোগী শক্তি হিসেবে প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের হটিয়ে দিয়ে সেসব স্থান নিজেরা দখল করে নেন। ১৭৫৭ সালের পর থেকে মীর কাশিম, মজনু শাহ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, টিপু সুলতান, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রমুখের নেতৃত্বে এ সশস্ত্র সংগ্রাম চলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত। নানা বাস্তব কারণে এসব সশস্ত্র সংগ্রামকে ইংরেজরা পর্যুদস্ত করে দিতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যুদস্ত হবার পর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র, কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ মহা উল্লাসে ফেটে পড়ে মুসলমানদের প্রতি ধিক্কার জানাতে এবং ইংরেজ সরকারের স্তব-স্তুতিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন।

এদিকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যুদস্ত হওয়ার পর নবউৎসাহে ইংরেজদের মুসলিম নির্যাতন অভিযান শুরু হলে তদানীন্তন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজবিরোধিতার পথ পরিহার করে হিন্দুদের মত ইংরেজদের সঙ্গে সাময়িকভাবে হলেও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের এগিয়ে নেয়ার পথে

অগ্রসর হন। এই সহযোগিতার যুগের এক পর্যায়ে ১৯০৫ সালে প্রধানত প্রশাসনিক কারণে বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করে ঢাকায় রাজধানীসহ ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলে নবাব সলিমুল্লাহ তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কোলকাতা প্রবাসী হিন্দু জমিদাররা এর মধ্যে পূর্ববঙ্গস্থ তাদের জমিদারীর ওপর তাদের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে বৃটিশ সরকার মাত্র ছয় বছরের মধ্যে তাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত রদ ঘোষণা করেন। নতুন প্রদেশে দীর্ঘ অবহেলিত পূর্ববঙ্গের জনগণের উন্নয়নের কিঞ্চিৎ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণে বৃটিশ সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গবাসী জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের এই ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার তাদের অন্যতম দাবী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ঘোষণা করে। এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করে দেন কোলকাতাকেন্দ্রিক কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা।

বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদারপন্থী হিন্দু নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৩ সালে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু কট্টর হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের বিরোধিতার কারণে এই সুন্দর প্রয়াসও শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে যায়। এভাবে অখণ্ড ভারতীয় কাঠামোর মধ্যে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা উত্থাপিত এক প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই দাবীর ভিত্তিতে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়, তাই ইতিহাসে পাকিস্তান আন্দোলন নামে খ্যাত হয়ে আছে। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের মুসলিম জনগণ এই দাবীর সপক্ষে একবাক্যে তাদের রায় ঘোষণা করলেও নানা কারণে এর বিরোধিতা চলতেই থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে মুসলিম লীগ লেজিসলেটারদের এক কনভেনশনে বাংলার তদানীন্তন নেতা শহীদ সোহরওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব আংশিক সংশোধন করে আপাতত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে একাধিকের বদলে একটি (পাকিস্তান) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। এই দাবীর প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে একাধিকের বদলে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবতা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। কারণ নবগঠিত পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া ভাষা, আবহাওয়া, অর্থনীতি, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি বিষয়েও দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ছিল পার্থক্য। এসব পার্থক্যের কারণেই লাহোর প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের পর উভয় অঞ্চলের পার্থক্য মোকাবেলা করে সংহতি গড়ে তোলার যোগ্যতাও নেতাদের দু'একজন ব্যতীত কারো ছিল না। সর্বোপরি গণতন্ত্রচর্চার অনুপস্থিতিতে এবং প্রশাসনে অবাঙ্গালী বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্বের একনায়কত্ব গড়ে ওঠায় দু'অঞ্চলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘাত হয়ে পড়ে অনিবার্য। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে একসাথে সর্বপ্রথম যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দেখা গেল যে দলটি শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ মেজরিটি লাভ করলো, সেই আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পেলো না, অন্যদিকে যে দলটি পশ্চিম পাকিস্তানের বড় দুটি প্রদেশ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে নিরঙ্কুশ মেজরিটি লাভ করলো, সেই পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও লাভ করতে পারলো না। এতে স্পষ্ট বোঝা গেল, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের এক রাষ্ট্র হিসেবে একত্রে চলার দিন শেষ হয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দাবী ছিল উভয় অঞ্চলের নেতাদের এক টেবিলে বসে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পন্থায় দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। দূরদর্শী জননেতা মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব এবং পিপিপি নেতা ভুট্টোর প্রতি সে আহ্বানই জানিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রতি এ সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন– শান্তিপূর্ণ পথে এ বিভাজন সম্ভব না হলে লাখ লাখ লোকের রক্তের মধ্য দিয়ে এ বিভক্তি সংঘটিত হবে এবং এজন্য উভয় অঞ্চলের জনগণকেই অকল্পনীয় মূল্য দিতে হবে। কেন, কাদের কারণে এই বাস্তব পরামর্শ সেদিন গ্রহণ করা হয়নি তা আমরা জানি না। তবে বাস্তব সত্য এই যে, অবশেষে লাখ লাখ লোকের প্রাণের বিনিময়ে এবং অসংখ্য নারীর সম্ভ্রমহানির মধ্য দিয়ে পাকিস্তান থেকে

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে হয়েছে।

একথা নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান আন্দোলনে বর্তমান পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের তুলনায় বাংলার অবদানই ছিল প্রধান। ১৯৪৬ সালের যে নির্বাচনকে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর গণভোট বলে গণ্য করা হয়েছিল, সে নির্বাচনে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়নি। সরকার গঠন করেছিল ইউনিয়নিস্ট পার্টি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সরকার গঠন করেছিলেন কংগ্রেস সমর্থক পাকিস্তানবিরোধী নেতা ডা: খান সাহেব। সিন্ধুতে তুলনামূলকভাবে মুসলিম লীগ ভাল করলেও সরকার গঠনের উপযোগী নিরঙ্কুশ মেজরিটি লাভ করেনি। নির্বাচনে সিন্ধুতে কোন দলই নিরঙ্কুশ মেজরিটি লাভ করতে পারেনি। সেই ঘোর দুর্দিনে একমাত্র বাংলাতেই হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা এক প্রতিকুল পরিস্থিতিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কায়েদে আজমের হাত শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়।

শুধু ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের বাংলাদেশে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারের কথাই নয়, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের কৃতিত্বও ছিল বাংলার আরেক মুসলিম নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের। শুধু তাই নয় পাকিস্তান আন্দোলন ও অর্জনের দাবীদার প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাও করেন বাংলার আর এক বিখ্যাত মুসলিম নেতা নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলার মুসলিম নেতাকর্মী ও জনগণের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণও ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশী ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাওয়ায় অঞ্চল হিসেবে পূর্ববঙ্গ এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি মুসলমান যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনটা আর কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি। পাকিস্তান সংগ্রামে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে ঐ রাষ্ট্রের কাছে তাদের প্রত্যাশাও ছিল অনেক। সে প্রত্যাশার অনেকটাই তাদের পূরণ হয়নি। সে কারণে তাদের ক্ষোভও ছিল যথেষ্ট। এতসবের পরও সত্য এই যে, ১৯০ বছরের দীর্ঘ বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের পাট সম্পদ নিয়ে হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তোলা হয় পাট শিল্প। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরে নানা বঞ্চনা ও অবহেলার মধ্য দিয়েও পূর্ববঙ্গ হাঁটি হাঁটি পা-পা করে শিল্প যুগে প্রবেশ করে। পাট, বস্ত্র, চিনি, সার, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও অনেকখানি অগ্রসর হই আমরা। পাকিস্তান আমলে প্রচুর বঞ্চনা ও হতাশার মধ্য দিয়েও আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতটা অগ্রসর হই, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিস্ময়ের সাথে দেখা গেল এক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎমুখী অভিযাত্রা। ১৯৭০ সালেও আদমজীসহ যেসব কলকারখানা ছিল লাভজনক, সেগুলো স্বাধীনতার পর রাতারাতি লোকসানী হতে হতে এক পর্যায়ে রুগ্নশিল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে বিশ্বব্যাংক প্রভৃতির পরামর্শে বন্ধ করে দিতে হয়েছে কেন, সে কথা কি আমরা কখনও গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখেছি?

১৯৭০ সালের নির্বাচনকালে আমাদের দেশের চালের দাম ছিল সেরপ্রতি দশ আনা। নির্বাচনী প্রচার অভিযানকালে দশ আনার পরিবর্তে আট আনা সের দরে চাল খাওয়ানোর ওয়াদা দেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু দেখা গেল স্বাধীনতার কয়েক বছরের মাথায়ই চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে দশ টাকায় উঠে গেল। আগে বলা হত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কারণে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে চিরমুক্তির পরও আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে কেন তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি? যদি না দেখে থাকি, তা হলে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ঘটা করে যান্ত্রিক প্রাণহীন পদ্ধতিতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলেই কি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা এমনি এমনিতেই জোরদার ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে?

আমরা আগেই বলেছি, আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সার্থক হয়ে ওঠার পথে কি কি বাস্তব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে হবে এবং যে কোন মূল্যে সেসব সমস্যার সমাধান এবং প্রতিবন্ধকতার মূল উৎপাটন করতে হবে। আমরা আরও বলেছি, আমাদের স্বাধীনতা সার্থক না হয়ে ওঠার পেছনে যেমন রয়েছে কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতাভিত্তিক সমস্যা, তেমনি রয়েছে কিছু ভৌগোলিক বাস্তবতাভিত্তিক সমস্যা। এগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে শনাক্ত করে সেসবের সত্যিকার সমাধান খুঁজে বের করতে না পারি, তা হলে আমরা আমাদের স্বাধীনতার প্রতি যেমন সুবিচার করতে পারবো না, তেমনি আমাদের ২১৪ বছরের সুদীর্ঘ গৌরবজনক স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা

আত্মদান করেছেন এবং অন্যান্য উপায়ে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শনও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা কি ছিল? বাস্তবতা ছিল এই যে, ১৯৪০ সালের পূর্বের দিনগুলোতে শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের তদানীন্তন নেতারা অখণ্ড ভারতীয় কাঠামোর মধ্যে মুসলমানদের ন্যায্য দাবীদাওয়া পূরণের সম্ভাবনা না দেখেই ১৯৪০ সালে হিন্দু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত ভাগ করে মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছিলেন। ঐ দাবীর ভিত্তিতে যে সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আংশিক বাস্তবায়ন হিসাবে ১৯৪৭ সালে আমরা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসাবে প্রথম স্বাধীনতা লাভ করি। ভৌগোলিক ও অন্যান্য বাস্তব কারণে পাকিস্তান আমলে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পথে আমরা আমাদের দাবীদাওয়া পূরণের চেষ্টা করি। দেশে গণতন্ত্র থাকলে আমরা সে পথেই আমাদের দাবীদাওয়া পূরণ করতে পারতাম। কিন্তু তা না থাকায় এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গণরায় বাস্তবায়নের পরিবর্তে ২৫ মার্চের রাতে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তান বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়ার কারণে আমরা আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল, এ এক বাস্তব সত্য। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে, এর লক্ষ্য যতটা না ছিল একটি প্রকৃত স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে উঠতে সাহায্য করা, তার চাইতেও বেশী ছিল একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুর্বল করা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান বাহিনীর পরিত্যক্ত কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও উন্নতমানের সামরিক সরঞ্জামাদি এবং আমাদের মিল-কারখানার যন্ত্রপাতি রাতারাতি ভারতে পাচার করে নিয়ে যাওয়ার সাথে একমাত্র ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর মুর্শিদাবাদ থেকে বিপুল মূল্যবান সম্পদ, হীরাজহরতের ভান্ডার লুণ্ঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ারই তুলনা চলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদেই সেদিন ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সূচিত হয়। একইভাবে দেখা যায়, পাকিস্তানী বাহিনীর ফেলে যাওয়া কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠনের মাধ্যমে সেই যে ভারতের সামরিক শক্তি বড় মাপে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় তা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং সেই শক্তির জোরে ভারত আমাদের তালপট্টি দ্বীপ জবর দখল করে রেখেছে এবং প্রতিদিন বিনা উস্কানিতে বিএসএফকে দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের নিরপরাধ বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করে চলেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পাট শিল্প সুকৌশলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে এদেশে এজেন্টদের মাধ্যমে কাঁচা পাট অবৈধ উপায়ে পাচার করে তাদের পাটকলের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে।

বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা ক্রুসেডের যে ঘটনা দেখতে পাই তা যে পলাশীর মূলেও কার্যকর ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি পলাশীরও আগে মারাঠাদের সাথে ইংরেজদের গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ঘটনার মাধ্যমে। ১৭৫৭ সালে পলাশী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা ধ্বংস করার মূলে যেমন ক্লাইভের সঙ্গে জগৎশেঠদের আঁতাত কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তেমনি সাতচল্লিশ সালে নেহরু-মাউন্টব্যাটেন আঁতাতের ফলে বাংলাদেশ তথা তদানীন্তন পাকিস্তানের বহু মুসলিমপ্রধান এলাকা অন্যায়ভাবে ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়। নেহরুর মত মাউন্টব্যাটেনেরও বিশ্বাস ছিল ১৯৪৭ সালে মুসলিম মেজরিটি বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয় ভাগের মধ্য দিয়ে যে কীটদষ্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হবে তা কয়েক মাসের বেশী টিকবে না। ১৯৪৭ সালের মে মাসে কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কাছে এক পত্রে নেহরু লিখেছিলেন, 'আমরা অখণ্ড ভারতের লক্ষ্য বিসর্জন দিয়েছি, এ কথা সত্য নয়। আমরা ভারতবিভাগ মেনে নিয়েছি কেবল মাত্র বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের শর্তে। কারণ একমাত্র এ পথেই আমরা অখণ্ড ভারত ফিরে পাব। (দ্রষ্টব্য– রাজবিদ্রোহী আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী : জামালুদ্দিন চৌধুরী)।

এখন একথা স্পষ্ট যে, ভারতীয় নেতৃত্ব কখনও পার্টিশনকে মনে প্রাণে মেনে নেননি। আর যেখানে তারা সাতচল্লিশের পার্টিশনই মেনে নেননি সেখানে ঐ পার্টিশনের ফলে সৃষ্ট পূর্ববঙ্গের শক্তিশালী স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে রূপান্তর মেনে নেবেন, তার সম্ভাবনা কোথায়? ভারত যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দিয়েছিল তা যে প্রকৃত স্বাধীন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে নয়, একটি পাপেট রাজ্য হিসাবে পেতে, তার প্রমাণ যেমন সে রেখেছে একাত্তর পরবর্তী দিনগুলোতে ফারাক্কাসহ সবগুলো অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ

বা গ্রোয়েন নির্মাণ, বেরুবাড়ীর পরিবর্তে তিনবিঘা হস্তান্তর না করা, বঙ্গভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন, ট্রানজিট আদায় ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিতে বাংলাদেশকে বাধ্য করা, তালপট্টি দ্বীপ দখল প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকারকে ৭ দফা অসম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করার মাধ্যমে। ঐ ৭ দফা চুক্তিতে বলা হয়েছিল :

এক. মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডের অধীনে থাকবে,

দুই. স্বাধীনতার পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থান করবে,

তিন. বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না,

চার. অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য হতে একটি প্যারামিলিশিয়া গঠন করা হবে,

পাচ. দুই দেশের মধ্যে অবাধ সীমান্তবাণিজ্য চলবে,

ছয়. যেসব কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের বরখাস্ত করে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা শূন্য স্থান পূরণ করা হবে, এবং

সাত. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেয়া হবে।

[দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে র' ও সি আই এর ভূমিকা : মাসুদুল হক]

এর পর বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা থাকে কি? ভারতের এই আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইদানীং নতুন করে যোগ হয়েছে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিদেশীয় মৈত্রীচুক্তি। এমন একটা সময় ছিল যখন বাহ্যতঃ হলেও ভারতের একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ছিল। ভারত তখন ফিলিস্তিন প্রশ্নে প্রকাশ্যে আরবদের পক্ষ নিত। সেই ভারত এখন নিজে উদ্যোগী হয়ে ইসরাইল ও আমেরিকার সাথে ত্রিদেশীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এখন বাংলাদেশের গ্যাস, তেল সম্পদ ভারতের হাতে তুলে দিতে ভারতকে দাবী জানাতে হয় না। সে কর্মটি এখন করছে আমেরিকা এবং তার নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি সংস্থা।

বাংলাদেশের অপরাধ বাংলাদেশ শুধু তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশই নয়, মুসলিম অধ্যুষিত এমন একটি দেশ যার কাছেধারে কোন মুসলিম দেশ আর নেই। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অসস্থা কেবল আরব পরিবেষ্টিত ইসরাইলের সাথেই তুলনা হতে পারে। শত্রুর কাছ থেকেও অনেক সময় অনেক কিছু শেখার থাকে। ইসরাইলের সরকার ও জনগণ শত্রুবেষ্টিত থেকেও যদি তার স্বাধীনতা অজেয় করে তুলতে পারে, বাংলাদেশেরও তা না পারার কথা নয়। শুধু থাকতে হবে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে প্রতিটি বাংলাদেশীর নিরন্তর সচেতন ভূমিকা এবং স্বাধীনতা রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করার সংকল্প। ভারতের ইতিহাস থেকেও রয়েছে আমাদের অনেক কিছু শেখার। ভারতের কাছে আমাদের সবচাইতে বড় যা শেখার তা হলো যে কোন মূল্যে গণতন্ত্রচর্চা অব্যাহত রাখা। আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ২১৪ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণে সৃষ্ট সমস্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে আমাদের স্বাধীনতার পথের সকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে দৃঢ় সংকল্প হতে পারি, দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের স্বাধীনতার প্রতি শ্যেণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস পাবে না ইনশা আল্লাহ।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিদ্যুতের জন্য আবেদন

ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া থানার অন্তর্গত গোতয়াতলা ইউনিয়নের হরিপুর একটি জনবহুল, গুরুত্বপূর্ণ

এলাকা। ব্যবসা-বাণিজ্য, সেচ প্রকল্প ও শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটি ঐতিহ্যবাহি ও উন্নত গ্রাম। গ্রামটির ঠিক উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছোট নদী। নদীটির নাম ঘাগোটিয়া নদী। নদীটি থেকে সেচের মাধ্যমে ঐ এলাকার প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে ইরি বোরো ধান উৎপন্ন হয়। এখানে প্রায় ৭০ হাজার মেট্রিকটন ধান উৎপাদন হতো। বর্তমানে ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এখানকার গরীব কৃষকগণ তাদের মোট জমির এক তৃতীয়াংশ জমিতে ইরি, বোরো ধান ফলাতে পারছেন না। ফলে কৃষকগণ দিন দিন দারিদ্রের মুখে পড়ছেন। সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিলে এখানে প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ হাজার মেট্রিকটন ধান উৎপাদন করা সম্ভব, এতে করে দেশে যে পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি তার কিছুটা হয়তো পূরণ করা সম্ভব হবে বলে এলাকাবাসীর প্রত্যাশা।

এলাকাটিতে পাশাপাশি (৮-১০)টি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। গ্রামটির দক্ষিণ দিকে গোয়াতলা বাজারে বিদ্যুৎ রয়েছে। এখানে পাশাপাশি ৫টি ডিপ মেশিন ও ১০০ থেকে ১৫০টি সেলো মেশিন রয়েছে। এই মেশিনগুলো দিয়ে এখানে সেচ পাম্পের সাহায্যে ফসলের জমিতে পানি দেয়া হয়। গ্রামটিতে একটি প্রাইমারি স্কুল ও দুটি মসজিদ রয়েছে। স্কুলটিতে বিশেষ করে কম্পিউটার শিক্ষার একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতের অভাবের কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। এলাকাটি অন্যান্য এলাকা হতে আলাদ। অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রামটি সন্ধ্যা হলেই ডাকাতদের অভয়ারণ্যের পরিণত হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, নির্ঘুম ও নির্জন এলাকায় বিদ্যুতের অভাবে দুর্যোগকালীন সময়ে রেডিও টিভি থেকে পর্যাপ্ত সর্তকবানী পাওয়া যায়নি। বিদ্যুৎ না থাকায় মশার তাণ্ডব বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুতের অভাবের কারণে সর্বক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অতএব, বিষয়টির প্রতি ময়মনসিংহ পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি-৩ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে উক্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর প্রত্যাশা।

এলাকাবাসীর পক্ষে–

মোঃ হামিদুল ইসলাম (রফিকুল), মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ দিদারুল ইসলাম (কাদের)

হরিপুর, গোয়াতলা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।